মানসিকতার পরিচায়ক। সুবহানাল্লাহ্ ! কত উত্তম ও পবিত্রতম শিক্ষা! যে বিষয়টি সাধারণভাবে দু'টি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও দু'টি পরিবারের ধ্বংসের কারণ হতে যাচ্ছিল, এভাবে সেটিকে স্থায়ী ভালবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত করা হয়েছে।

এসব নির্দেশের পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ— وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সীমারেখা লংঘন করবে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতিসাধন করল। বলা বাহুল্য, পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রতিটি অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার হবে। অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু-না-কিছু ভোগ করতে হয়।

پنداشت ستمگر کہ جفا بر ما کرد
بر گردن وے بماند و بر ما بگذشت

কোরআনে-হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধুমাত্র আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না ঃ দ্বিতীয় মাস'আলা হচ্ছে এই—এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا —খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর হচ্ছে এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলিয়্যত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা

দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসাবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন---তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, তা হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাসমুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে মার্দুবিয়্যাহ্ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, আর ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রা) থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

ثلث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة -

অর্থাৎ তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক, (তিন) রাজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার।

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন (স্ত্রী ও পুরুষ) বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না।

এ আদেশ বর্ণনা করার পর কোরআনে করীম নিজস্ব ভঙ্গিতে মানুষকে আল্লাহ্র-আনুগত্য ও পরকালের ভয় প্রদর্শন করার পর উপদেশ দিয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۝ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

অর্থাৎ "স্মরণ কর আল্লাহ্ তা'আলার সেই নিয়ামতের কথা, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং বিশেষভাবে স্মরণ কর সেই নিয়ামত, যা কিতাব ও হেকমত রূপে তোমাদেরকে দান করেছেন। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি তোমাদের নিয়ত, ইচ্ছা এবং অন্তর্নিহিত গোপন তথ্য সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত।" সুতরাং স্ত্রীকে যদি তালাক দিয়ে বিদায়ই করতে হয়, তবে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, একে অপরের অধিকার হরণ এবং পারস্পরিক অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাক। প্রতিশোধ গ্রহণ বা স্ত্রীকে অযথা দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করো না।

তালাকের উত্তম পন্থা ঃ তৃতীয়ত, শরীয়ত বা সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে সুস্পষ্ট শব্দে প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাক দেবে, যাতে ইদ্দত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে। এমন শব্দ বলতে নেই, যাতে তৎক্ষণাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক

ছিন্ন হয়ে যায় ; যাকে 'বায়েন' তালাক বলা হয়। আর তিন তালাকও দেবে না, যার ফলে উভয়ের মধ্যে পুনর্বিবাহও হারাম হয়ে যায়। طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ শব্দটির নিঃশর্ত উল্লেখই এদিকে ইঙ্গিত করছে। কারণ, এ আয়াতে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা যদিও প্রত্যাহার-যোগ্য এক বা দুই তালাক সম্পর্কিত, জায়েয বা তিন তালাক সম্পর্কে নয়, কিন্তু কোরআন কোন শর্ত আরোপ না করে একথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছে যে, তালাকের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হচ্ছে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়া। তালাকের অন্যান্য উপায় তাঁর পছন্দনীয় নয়।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনর্বিবাহে বাধা দেওয়া হারাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে সেই সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সাথে করা হয়। তাদেরকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। এরূপ অন্যায়কেই এ আয়াত দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছে।

এ আয়াতের শানে-নযুলও এমনি এক ঘটনা। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) তাঁর বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি তাকে তালাক দেয় এবং পরে কৃতকর্মের দরুন অনুতপ্ত হয়ে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে মনস্থ করে এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও এতে সম্মত হয়। যখন সেই ব্যক্তি এ ব্যাপারে হযরত মা'কালের নিকট প্রস্তাব করে, তখন তিনি যেহেতু তালাক দেওয়াতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই উত্তর দেন যে, আমি তোমাকে সম্মান করেই আমার বোনকে তোমার নিকট বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সে সম্মানের মূল্য দিয়েছ তাকে তালাক দিয়ে। এখন পুনরায় তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে আর তোমার বিবাহাধীনে যাবে না।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর এক চাচাত বোনের ব্যাপারেও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে মা'কাল ও জাবেরের এ কাজকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং একে না-জায়েয বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাহাবীগণ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সত্যিকার ভক্ত ছিলেন। এ আয়াত শোনা-মাত্র মা'কালের সমস্ত ক্রোধ পড়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বোনের পুনর্বিবাহ তারই সাথে দিয়ে দেন। আর কসমের কাফ্‌ফারাও আদায় করেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ও তাই করেন। স্ত্রীকে তালাক প্রদানকারী স্বামী এবং তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অভিভাবকবৃন্দ—এ উভয় শ্রেণীর প্রতিই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তাদের পছন্দ করা স্বামীর সাথে বিয়ে করা থেকে বিরত রেখো না। তা সে প্রথম স্বামীই হউক না কেন, যে তাকে তালাক দিয়েছে বা অন্য কেউ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঃ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ- তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাযী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাযী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাযীও হয় আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায় অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের, যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে إذا تراضوا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

অর্থাৎ "এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ—"এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ।"---এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেতনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে

বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়ত সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সেই পাপের অংশীদার তারাও হবে, যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে। আর এই দুষ্কর্মের পরিণতি পরকালের শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগেই হয়তো বাধাদানকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও খুনাখুনির আকারে পতিত হতে পারে। দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহই এর প্রমাণ। অনুরূপ যদি বিয়ে করতে বাধাদান করা হয় অথবা তার পছন্দ ব্যতীত তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য করা সাধারণভাবে করা হয়, তবে এর পরিণামও স্থায়ী শত্রুতা, ফেতনা-ফাসাদ বা তালাকের পথ উন্মুক্ত করবে। আর এসবের অশুভ পরিণতি সবার জানা। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তার পছন্দসই ব্যক্তির সাথে বিয়ে করা থেকে তাকে বিরত না করাই তোমাদের জন্য পবিত্রতার বাহক ও কল্যাণকর।

তৃতীয় বাক্যে বলা হচ্ছে ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ—অর্থাৎ "তোমাদের ভালমন্দ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না।" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে বিয়ে হতে বিরত রাখে তারা নিজেদের ধারণা মতে এতে কিছু উপকারিতা ও কল্যাণ অনুভব করে। যেমন, স্বীয় ইজ্জত-সম্মান, মান-অভিমান অথবা কিছু আর্থিক সুবিধা, এসব শয়তানী ধারণা ও অপাত্রে সুবিধার সন্ধান বন্ধ করার জন্যই ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভালমন্দ সম্পর্কে জানেন, কিন্তু তোমরা তা জান না। কাজেই যে নির্দেশ তিনি দেন, তা সেদিক লক্ষ্য রেখেই দেন। আর যেহেতু তোমরা কর্মের তাৎপর্য এবং পরিণাম সম্পর্কে অবগত নও, তাই তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ ধ্যান-ধারণা দ্বারা এমন সব বিষয়েও নিজের উপকার চিন্তা কর, যাতে তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ ও ধ্বংসের কারণ রয়েছে। তোমরা যে মান-ইজ্জত রক্ষা করতে চাও, যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক আত্মসংযম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে সমস্ত মান-ইজ্জত মাটিতে মিশে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় অর্থ হাসিল করার যে ধারণা পোষণ কর এতে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন ফাসাদে জড়িয়ে পড়বে যাতে অর্থের বদলে জানও যেতে পারে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি ঃ কোরআন করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরী করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সেই বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

কোরআন করীমের এহেন বর্ণনারীতি শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, বরং যাবতীয় বিধান বর্ণনাতেই রয়েছে। একটি বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। প্রত্যেক আইনের বর্ণনার আগে পরে ঃ

اِتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

ইত্যাদি বাক্য যোগ করা হয়। কোরআন সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব গোষ্ঠীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও স্তরের জন্য ব্যাপক একটি আইনগ্রন্থ। এতে শাস্তি-সাজার বর্ণনাও রয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনাভঙ্গি সমগ্র বিশ্বের আইনগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর বর্ণনারীতি যতটা শাসক-সুলভ তার চাইতে বেশী অভিভাবকসুলভ। এতে প্রতিটি বিধান বর্ণনার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই বিধানের লংঘন কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়। আল্লাহ্র বিধান কোন অবস্থাতেই পার্থিব সরকারসমূহের মত নয় যে, একটি বিধান তৈরী করে তা প্রচার করেই ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুত এহেন বিধানের অমান্যকারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

তাছাড়া কোরআনের এই স্বতন্ত্র বর্ণনারীতির ধারা এবং বিশেষ বর্ণনারীতির সুদূর-প্রসারী উপকারিতা হচ্ছে এই যে, একে দেখে মানুষ শুধু এজন্যই এর বিধানের অনুসরণ করে না যে, এর বিরুদ্ধাচরণ বা একে অমান্য করলে দুনিয়াতেই তাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, বরং তখন তার মনে দুনিয়ার শাস্তির চাইতে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও পরকালের শাস্তির চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠে। আর সে চিন্তার কারণেই তার ভিতর ও বাহির এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুকে সমান করে দেখে। তখন সে এমন কোন স্থানেও এ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না, যেখানে কোন প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত পুলিশেরও পৌঁছা সম্ভব নয়। কারণ, তার বিশ্বাস রয়েছে যে, মহান পরওয়ারদেগার সর্বত্রই বিদ্যমান। তিনি সবকিছু দেখেন এবং প্রতিটি বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এ কারণেই কোরআনী শিক্ষা যে সামাজিক মূলনীতি নির্ধারণ করেছে, প্রতিটি মুসলমান তার অনুসরণ করাকে জীবনের সর্ব-বৃহৎ উদ্দেশ্য বলে মনে করেন।

কোরআনী রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যও তাই। এতে একদিকে থাকে আইনের সীমারেখার বর্ণনা, অপরদিকে ভীতি-প্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা। এতে করে মানব চরিত্রকে এমন উচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় যে, তখন এ আইনের সীমারেখা বা গণ্ডীর মধ্যে থাকাই তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। ফলে সে তার যাবতীয় আবেগ-অনুরাগ ও রিপুজনিত কামনা-বাসনা পরিহার করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাতে উল্লিখিত অপরাধ ও শাস্তির ঘটনাবলীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, শুধু বিধান প্রবর্তন করেই কখনও কোন জাতি কিংবা ব্যক্তির সংশোধন সম্ভব হয়নি। পুলিশ ও সৈন্যের দ্বারা কখনও অপরাধ দমন করা যায়নি, যতক্ষণ না আইনের সাথে সাথে আল্লাহ্র ভয় ও মাহাত্ম্যের ছাপ মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রকৃত প্রেরণা হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের চিন্তা। তা না হলে অপরাধ থেকে কেউ কাউকে বিরত রাখতে পারে না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۭ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَاۗرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۭ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۲۳۳

(২৩৩) আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোরপোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তান-দেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মায়েরা নিজের সন্তানদিগকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করবে। (এ সময়টি তার জন্য) যে স্তন্যদানের সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তান যার, তার দায়িত্ব রয়েছে সেই মাতার

ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ (ইত্যাদি), প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবং কোন ব্যক্তিকে কোন আদেশ দেওয়া হয় না, কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী, কোন মাতাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না তার বাচ্চার জন্য। (যদি পিতা জীবিত না থাকে) বর্ণিত পন্থানুযায়ী (তাহলে বাচ্চার লালন-পালনের ব্যবস্থা) তার নিকটবর্তী আত্মীয়ের দায়িত্ব। (শরীয়তানুযায়ী যে ব্যক্তি বাচ্চার উত্তরাধিকারী হয়। অতঃপর বুঝে নাও যে,) যদি পিতা-মাতা দু'বছর পূর্ণ হবার আগেই বাচ্চার দুগ্ধপান বন্ধ করতে চায় পরস্পর সন্তুষ্টি ও পরামর্শক্রমে, তবে তাতেও তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা (মাতা-পিতা থাকা সত্ত্বেও কোন উপকারের জন্য যেমন, মায়ের দুধ যদি এমন হয় যে, এতে বাচ্চার ক্ষতি হয় তবে) বাচ্চাকে অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ হবে না। যদি তাকে সে ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে দিতে চাও, তাকে যা দেওয়ার চুক্তি হবে তা নিয়মানুযায়ী দিতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজ-কর্মের সব খবরই রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও দুধপান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেওয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও জুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ

—অর্থাৎ মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে যদি কোন বিশেষ অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য না করে।

এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাস'আলা বোঝা গেল।

শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব ঃ প্রথমত এই যে, শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তন্যের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (র) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্যের দুধপান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۔ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۔

অর্থাৎ "নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার দায়িত্ব। কাকেও সামর্থ্যের উর্ধ্বে কোন আদেশ দেওয়া হয় না।"

এতে প্রথমত লক্ষণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশে কোরআন-মজীদে والدات শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ والد-কে বাদ দিয়ে المولود له ব্যবহার করা হয়েছে অথচ কোরআনের অন্যত্র والد শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ অবশ্য এক্ষেত্রে والد এর পরিবর্তে مَوْلُودٌ لَّهُ ব্যবহার করার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে যে, কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং অভিভাবকসুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমত কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

এখানেও বাচ্চার খোরাক পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে, অথচ সে পিতা-মাতার যৌথ সম্পদ। এতে পিতার পক্ষে এ আদেশকে বোঝা না মনে করা সম্ভব ছিল। তাই والد শব্দের স্থলে مولود له শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই শিশু যার জাত। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব, কিন্তু শিশু পিতার বলেই অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে। যেহেতু শিশু পিতার, সুতরাং শিশুর খরচের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব ; আর মাতার

ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।---(মাযহারী)

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে হবে ঃ শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহ্গণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, যদি স্বামী ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশী এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতহুল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্র ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ـ

অর্থাৎ "কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর কোন পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।" অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয়, আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ ঃ পঞ্চম মাস'আলা لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকা পর্যন্ত হুকুম ঃ ষষ্ঠ মাস'আলা মাতা শিশুকে স্তন্যদানের জন্য বিবাহ-বন্ধন বহাল থাকাকালে এবং তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের সময়ে কোন পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তার খোরপোষ যা শিশুর পিতা স্বাভাবিকভাবে বহন করে তাই যথেষ্ট; অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করা পিতাকে কষ্ট দেওয়া বৈ কিছু নয়।

আর তালাকের ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবার পরেও যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী শিশুকে স্তন্যদান করতে থাকে, তবে সে এজন্য শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে এবং পিতাকে তা দিতে বাধ্য করা হবে। কেননা, এ দায়িত্ব বহন না করায় মায়ের ক্ষতি হয়। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এ পারিশ্রমিক অন্যান্য স্ত্রীলোক সাধারণত যা পেয়ে থাকে, তাই পাবে। যদি এর চাইতে বেশী দাবী করে, তবে পিতা অন্য ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করানোর কাজ সমাধা করার অধিকারী হবে।

এতীম শিশুদের দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার? ইরশাদ হয়েছে ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ —অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তখন যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তিনি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব বহন করবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিতৃহীন শিশুর সঠিক উত্তরাধিকারী, তিনিই দুগ্ধ, ধাত্রীমাতা বা ধাত্রীদের খোরপোষ বা পারিশ্রমিকের দায়িত্ব নেবেন। এমন উত্তরাধিকারী যদি একাধিক থাকে, তবে প্রত্যেকে তার মীরাসের অংশের অনুপাতে খরচ বহন করবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন যে, এতীম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে একথাও বোঝা গেল যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়-ভার দুধ পান শেষ হওয়ার পরেও তাদের উপরেই বর্তাবে। কেননা, এখানে দুধের কোন বিশেষত্ব নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ভরণ-পোষণ। যদি এতীম শিশুর মা ও দাদা জীবিত থাকেন, তবে তারাই শিশুর মোহরেম ও উত্তরাধিকারী। অতএব, তার ভরণ-পোষণ মীরাসের অংশের অনুপাতে তাদের উপরই ন্যস্ত হবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ খরচ মাতা এবং দুই-তৃতীয়াংশ খরচ দাদা বহন করবেন। এতে এ কথাও বোঝা গেল যে, এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দাদার উপর দাদার অন্যান্য সন্তানদের চাইতেও বেশী। কেননা, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু না-বালেগ এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর ওয়াজিব। তবে সম্পত্তিতে পুত্রদের জীবিত থাকাকালে নাতিকে অংশীদার করা মীরাসের আইনের পরিপন্থী। কারণ নিকবর্তী সন্তান থাকা অবস্থায় দূরবর্তী সন্তানকে মীরাস দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে দাদা এতীম নাতির জন্য কিছু ওসীয়ত করবেন এবং সে অধিকার তাঁর আছে। এ ওসীয়তের পরিমাণ সন্তানদের অংশ হতে বেশীও হতে পারে। এভাবে এতীম নাতির প্রয়োজনও পূর্ণ করা হবে এবং মীরাস আইন মোতাবেক নিকটতম ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তীকে অংশ না দেওয়ার বিধানটিও রক্ষা হবে।

স্তন্যপান বন্ধ করার আদেশ ঃ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্তন্যপানের

সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যপান বন্ধ করা সাব্যস্ত করে এবং তা মায়ের কোন অসুবিধার জন্যই হোক বা শিশুর কোন রোগের জন্যই হোক, তাতে কোন পাপ নেই। এখানে 'পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের' শর্ত আরোপ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্তন্যদান বন্ধ করার ব্যাপারটিও সন্তানের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হতে হবে, পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের কারণে শিশুর ক্ষতি করা যাবে না।

মা ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা স্তন্যপান করানোর হুকুম ঃ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۝

অর্থাৎ যদি তোমরা কোন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিশুকে মা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতে কোন পাপ নেই। তবে এর শর্ত হচ্ছে এই যে, স্তন্যদানকারিণী ধাত্রীর যে পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করা হবে তা পুরোপুরিভাবে প্রদান করতে হবে। যদি তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয়, তবে সে অপরাধের পাপ তার উপর থাকবে।

এতে আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সে স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের কথা পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে কোন রকম বিবাদ সৃষ্টি না হয় এবং নির্ধারিত সময়ে তার এ পারিশ্রমিকও আদায় করে দিতে হবে। এতে টালবাহানা করা চলবে না।

দুধ পানের ব্যাপারে এসব আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর কোরআনের নিজস্ব বর্ণনা-ভঙ্গি অনুযায়ী বিধি-বিধানের উপর আমল করার জন্য এবং সর্বাবস্থায় এর উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্‌র ভয় এবং তিনি যে সর্বজ্ঞানের অধিকারী এ ধারণা পেশ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মনে রেখো, তিনি তোমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যদি কেউ দুধ পান বা দুধ ত্যাগের ব্যাপারে আলোচ্য নিয়মের পরিপন্থী কিছু করে অথবা শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে এ সম্পর্কে মনগড়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে সে সাজা ভোগ করবে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ

بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ
بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۗءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا
قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সেই স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা! তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে। (২৩৫) আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের বর্ণনা ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

...وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ০ আর যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, সেসব স্ত্রী (বিয়ে ইত্যাদি থেকে) বিরত থাকবে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত। অতঃপর নিজেদের (ইদ্দতের) মেয়াদ যখন অতিক্রান্ত করে ফেলবে, তখন এসব কাজ করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে তা করতে হবে নিয়মানুযায়ী। (যদি কেউ কোন কাজ নিয়মের ব্যতিক্রম করে, আর তোমাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দাও, তবে তোমরাও সে পাপের অংশীদার হবে) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। আর সেসব স্ত্রীলোককে (যারা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করছে)। ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের (বিয়ের) প্রস্তাব করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। (যেমন —এরূপ বলা হয় যে, আমার একজন নেক স্ত্রীলোকের প্রয়োজন) অথবা নিজ মনে (তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা) গোপনে পোষণ কর (তবুও পাপ হবে না। এ অনুমতির কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একথা জানেন যে, তোমরা এ স্ত্রীলোক সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা করবে পরিষ্কার ভাষায়। কিন্তু তার (বিয়ের আলোচনাই) করবে না যদি না তা নিয়মানুযায়ী হয়। আর যদি তা নিয়মানুযায়ী হয় তাতে কোন দোষ হবে না। (আর নিয়মানুযায়ী অর্থ হচ্ছে ইশারায় বলা) এবং তোমরা (উপস্থিত ক্ষেত্রে) বিবাহ সম্বন্ধের ইচ্ছাও করবে না। যতদিন পর্যন্ত ইদ্দতের নির্ধারিত সময় শেষ না হয়। আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথাও জানেন। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করবে। (এবং অন্তরে লজ্জাকর কাজের ইচ্ছা করবে না) এবং (এও) দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইদ্দত সংক্রান্ত কিছু হুকুম ঃ (১) স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজসজ্জা করা, সুরমা, তৈল ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ঔষধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েয নয়। বিয়ের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও দুরস্ত নয়। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাত্রে অন্য ঘরে থাকাও দুরস্ত নয়। অন্য বিয়ের আলোচনার সঙ্গে যে غَيْرَ শব্দ বলা হয়েছে এই তার অর্থ এবং আদেশও তাই। যে স্ত্রীলোক বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অর্থাৎ যার তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীগৃহে ইদ্দত পালনকালে দিনের বেলায় অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

(২) চাঁদের শুক্লপক্ষে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ত্রিশ দিনেরই হোক অথবা উনত্রিশ দিনের, অবশিষ্ট চাঁদের হিসাবেই ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। আর যদি শুক্লপক্ষের পরে মৃত্যু হয়, তবে প্রত্যেক ত্রিশ দিনে একমাস ধরে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন হবে। তাতে মোট ১৩০ দিন পূর্ণ হবে। এ মাস'আলা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। এ সময় অতিবাহিত হয়ে যখন মৃত্যুর সে সময়টি ঘুরে আসবে তখনই ইদ্দত শেষ হবে। আর যে বলা হয়েছে, যদি স্ত্রীলোক নিয়মানুযায়ী কিছু করে, তবে তাতে তোমাদেরও কোন পাপ হবে না,

এতে বোঝা গেল যে, যদি কেউ শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করে, তবে অন্যের উপরও সাধ্যানুযায়ী বাধা দেওয়া ওয়াজিব। তারা যদি বাধা না দেয়, তবে তারাও গোনাহ্গার হবে। আর 'নিয়মানুযায়ী' অর্থ হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত বিয়েটি শরীয়তানুযায়ীও শুদ্ধ এবং জায়েয হতে হবে ; আর হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

(২৩৬) স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব। (২৩৭) আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্ত্রী গমনের পূর্বে তালাক অনুষ্ঠিত হলে ঃ স্ত্রী গমনের পূর্বে অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে একত্রিত হওয়ার পূর্বে। পক্ষান্তরে স্ত্রী সহবাসের সুযোগ আসার পূর্বেই যদি তালাক অনুষ্ঠিত হয়, তবে এর দু'টি দিক রয়েছে। হয় বিয়ের সময় মোহর নির্ধারণ করা হবে না কিংবা মোহর নির্ধারিত হয়ে থাকবে। প্রথম অবস্থাটির বিধান বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ... ... حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ -

অর্থাৎ তোমাদের উপর (মোহরের) কোন প্রশ্ন উঠবে না যদি স্ত্রীকে এমন অবস্থায় তালাক দিয়ে থাক যে, তাকে তুমি স্পর্শ করনি, আর তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করনি। (এমতাবস্থায় তোমার উপর মোহরের দায়িত্ব আছে বলে মনে করো না) আর (মাত্র) তাকে (একটুই) উপকার করা সামর্থ্যশীল ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতানুযায়ী দায়িত্ব এবং অভাবীর পক্ষেও তার সামর্থ্যানুযায়ী (দায়িত্ব এক বিশেষ প্রকারে উপকার করা) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ওয়াজিব। উত্তম শিষ্টাচারীদের জন্য। (নির্দেশটি সবার জন্য। আর তার অর্থ হচ্ছে যে, তাকে অন্তত এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে।)

আর দ্বিতীয় অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ... ... إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

—আর যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কোন মোহর ধার্য করে থাক, তবে তার অর্ধেক পরিশোধ করা ওয়াজিব। (এবং বাকী অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে।) কিন্তু (দুটি অবস্থা এসব অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। তার একটি হচ্ছে এই যে,) যদি সেসব স্ত্রীগণ তাদের প্রাপ্য অর্ধেকও মাফ করে দেয়, (তবে এমতাবস্থায় এ অর্ধেকও ওয়াজিব নয়) অথবা (দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে এই যে,) বিয়ে (বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার) অধিকার যে ব্যক্তির ক্ষমতায় সে যদি ক্ষমা করে। (অর্থাৎ স্বামী যদি পূর্ণ মোহরই তাকে দিয়ে দেয়, তবে এ অবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে পূর্ণ মোহরই তাকে দিতে পারে) আর যদি (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের (পক্ষে প্রাপ্য হক) ক্ষমা করে দেয়, (তবে তা আদায় করা অপেক্ষা) পরহেযগারীর পক্ষে বেশী অনুকূল। (কেননা, ক্ষমা করে দিলে সওয়াব পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সওয়াবের কাজ করাই হল পরহেযগারী) এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শনকে অবহেলা করো না। (বরং প্রত্যেকেই অন্যের সাথে রেয়ায়েত করতে চেষ্টা করবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ খুব ভাল-ভাবেই দেখেন। (সুতরাং তোমরা যদি কারো সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার ভাল প্রতিদান দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... ... إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে যদি মোহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়ত, মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। চতুর্থত, মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে তাকে একজোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন-মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদানুযায়ী দেওয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য না করে। হযরত হাসান (রা) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ্ পাঁচশত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।---(কুরতুবী)

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক তাকে দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ---পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষ অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই নিদর্শন---যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ হতেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ—এর তফসীর রসূল (সা) নিজে বর্ণনা করেছেন ঃ وَلِىُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুকুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) হতেও উদ্ধৃত করেছেন। —(কুরতুবী)

এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেওয়ার সুযোগ সীমিত।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

(২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নামাযের হেফাযত ঃ আগে ও পরে তালাক সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে নামাযের হুকুম বর্ণনা করায় ইঙ্গিত করে যে, সত্যের আনুগত্যই হচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য। সামাজিকতা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্যান্য কল্যাণ লাভ ছাড়াও সেই লক্ষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন এগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান মনে করে বাস্তবায়িত করা হবে, তখন এদিকে মনোনিবেশ করাও কর্তব্য। তাছাড়া ঐসব বিধানের বাস্তবায়নে বান্দার হকও আদায় হয় বটে। পক্ষান্তরে বান্দার হক নষ্ট করা আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিমুখতারই নামান্তর। যার অপরিহার্য পরিণতি হল আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের প্রতিই অমনোযোগিতা। অধিকন্তু, আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে যারা সজাগ-সতর্ক থাকে, তাদের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে। যেহেতু নামাযে এ মনোযোগ অধিক মাত্রায় দিতে হয় এজন্য এ আলোচনা মধ্যখানে আনা হয়েছে, যাতে বান্দা এ মনোযোগিতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ... ... مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

—সতর্ক থাক সব নামায সম্পর্কে (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী (আসরের) নামায সম্পর্কে এবং (নামাযে) দাঁড়াও আল্লাহ্ তা'আলার সামনে অনুগত রূপে। তারপর যদি তোমাদের (নিয়মিত নামায পড়তে কোন শত্রুর) ভয় থাকে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা সওয়ার অবস্থায় নামায পড়। (তাতে তোমাদের মুখ যেদিকেই থাক, চাই তা কেবলার দিকে হোক কিংবা অন্য দিকেই হোক। আর রুকূ-সিজদা যদি শুধু ইশারা দ্বারাই করতে হয় তবুও) পড়তে হবে (এমতাবস্থায়ও এর উপর পাবন্দ থাক, ছেড়ে দিও না)। পরে যখন তোমরা (সম্পূর্ণ) নিরাপদ হবে (এবং সন্দেহ-সংশয়ও) থাকবে না, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। এভাবে তোমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে যা তোমরা (শান্তিপূর্ণ অবস্থায় করতে)। তোমরা যা জানতে না, তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে এই যে, মধ্যবর্তী নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা, এর একদিকে দিনের দুটি নামায---ফজর ও জোহর এবং অপরদিকে রাতের দুটি নামায---মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাকীদ এজন্য করা হয়েছে যে, অনেক লোকেই এ সময় কাজ-কর্মের ব্যস্ততা থাকে। আর হাদীসে 'কানেতীন বা আনুগত্যের' সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'নীরবতার সাথে'।

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয ছিল। আর এ নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে, যখন একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে সিজদার ইশারা রুকূর ইশারার চেয়ে একটু বেশী নীচু করবে। চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে না (যেমন যুদ্ধ চলাকালে) তখন নামায কাযা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় করবে।---(বয়ানুল-কোরআন)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً
لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

(২৪০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (২৪২) এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বিধবা স্ত্রীলোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ঃ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ০ ...আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় (তোমাদের পক্ষে) ওসীয়ত করে যাওয়া কর্তব্য নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এক বছরের (খাওয়া, পরা ও থাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে এমনভাবে) যাতে তাদের ঘর থেকে বের হতে না হয়। অবশ্য যদি (চার মাস দশ দিন অথবা প্রসবান্তে ইদ্দত অতিক্রম করে) নিজেই বেরিয়ে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (বিয়ে ইত্যাদি) যা নিজের ব্যাপারে স্থির করে, আর আল্লাহ্-তা'আলা অত্যন্ত মহান। (তাঁর বিরুদ্ধে আদেশ করো না) এবং তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ (প্রতিটি কাজে তোমাদের কল্যাণ সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যদিও তা তোমরা বুঝতে পার না)।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ... ... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ০—এবং সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কিছু কিছু উপকার করা (যার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা নেই) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (এবং তা) নির্ধারিত করা হয়েছে তাদের (স্বামীদের) উপর যারা (শিরক ও কুফর থেকে) বিরত থাকে (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি। চাই এ নির্ধারণ ওয়াজিবের পর্যায়ে হোক বা মোস্তাহাবের পর্যায়ে হোক)। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (আমল করার জন্য) স্বীয় আদেশ বর্ণনা করেন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, তোমরা (তা) বুঝতে (এবং সে মতে আমল করতে) পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

(১)—وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ... ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ০ জাহিলিয়ত আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের

স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছেঃ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا—কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মীরাসের বিধান নাযিল হয়নি এবং মীরাসের কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসীয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ— এর তফসীরে বোঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই ওসীয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকার ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া জায়েয ছিল না। তবে মৃত স্বামীর বাড়ীতে থাকা না থাকা ছিল স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েয ছিল। 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ এ স্থলে তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন বাড়ী-ঘর এবং অন্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছে; কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

(২) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ—তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেওয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেওয়া। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, যাদের সাথে স্বামী নির্জন-বাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ তার সমস্ত ধার্যকৃত মোহর দিয়ে দেওয়া। আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে মিসাল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা খোরপোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর

ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব তালাকে রাজ'ঈ হোক আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী! কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্র পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকুল) তোমরা কি তাদের সম্পর্কে অবগত নও, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে? অথচ তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার; মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার জন্য। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য (নির্দেশ) বলে দিলেন (তোমরা) মরে যাও, (তারা মরে গেল) অতঃপর তাদেরকে জীবিত করা হল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের (প্রতি) রহমতকারী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না (এবং এ ঘটনার উপর চিন্তা করে না)। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণশীল ও জ্ঞানী। যারা জিহাদ করে এবং যারা করে না তাদের সবার কথাই (তিনি) শোনেন, (প্রত্যেকের নিয়তের কথাই) জানেন (এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জিহাদের বিধান বর্ণনার পূর্ব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে

যায় যে, হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে ইবনে-কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন এক শহরে বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। তারা ভীত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে—মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না—তাদের কাছে দুজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেলো, একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না; তাই তাদের চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মত করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন ঃ

ايتها العظام البالية ان الله يامرك ان تجتمعى -

অর্থাৎ ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্র নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহ্র আদেশ শ্রবণ করলো। অনেক জড় বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু ও আল্লাহ্র অনুগত ও ফরমাঁবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী ও আল্লাহ্র অনুগত। কোরআন করীম أعطى كل شيئٍ خلقه ثم هدى—বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন। মাওলানা রুমী এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

خاک وباد وآب وآتش بنده اند + با من وتو مرده با حق زنده اند

অর্থাৎ 'মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন—সবই আল্লাহ্র দাস, আমার-তোমার দৃষ্টিতে সেগুলো মৃত, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে জীবিত।"

মোটকথা, একটিমাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃ স্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি আদেশ হলো, সেগুলোকে বল ঃ

ايتها العظام ان الله يأمرك ان تكتسى لحما وعصبا وجلدا

অর্থাৎ ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।

এ কথার সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহ্কে আদেশ দেওয়া হলো ঃ

ايتها الارواح ان الله يأمرك ان ترجع كل روح الى الجسد الذى كانت تعمره -

অর্থাৎ ওহে আত্মাসমূহ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগলো ঃ سبحانك لا اله الا انت —তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর সামনে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হয় যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা---তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক—আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কোরআন-মজীদ ইরশাদ করেছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ o —অর্থাৎ আপনি কি সেসব লোকদের ঘটনা লক্ষ্য করেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল?

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযুর (সা)-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুযুর (স)-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে اَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য ? মুফাসসিরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে الم تر দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুযুর (স)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুযুর (স)-এর

দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে الم تر দ্বারা الم تعلم অর্থাৎ আপনি কি জানেন না? বোঝানো হয়। তবুও الم تر শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইশারা করা। বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। الم تر—র পরে الى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অতঃপর কোরআন করীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وهم الوف অর্থাৎ সংখ্যায় ছিল তারা হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়-মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বললেন—তোমরা মরে যাও। আল্লাহ্র এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে আবার কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ شَيْئًا أَنْ يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

অতঃপর বলেছেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত, যা বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শত-সহস্র দয়া ও করুণার নিদর্শন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান

করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। কেননা মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়ত, কোনখানে মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয়। রসূল (সা)-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া দুরস্ত নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان هذا السقم عذب به الامم قبلكم فاذا سمعتم به فى الارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا- (بخارى ومسلم وابن كثير)-

অর্থাৎ "সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।"

তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারূক (রা) একবার শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। শাম সীমান্তে তবুকের নিকটে 'সারাগ' নামক স্থানে পৌঁছার পর জানতে পারলেন যে, শাম দেশে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। এ মহামারী শাম দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ মহামারীই 'আমওয়াস' নামে অভিহিত। কারণ, এ রোগ প্রথমে 'আমওয়াস' নামক গ্রামে আরম্ভ হয়েছিল, গ্রামটি বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত। পরে সেখান থেকে সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করে। হাজার হাজার মানুষ যাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ীও ছিলেন, যারা এ মহামারীতে মারা যান।

ফারূকে-আযম (রা) যখন মহামারীর ভয়াবহ সংবাদ শোনেন, তখন সেখানে অবস্থান করে সাহাবীগণের সাথে সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে কিনা—এ সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। সে পরামর্শের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে রসূলে করীম (সা)-এর বাণী শুনেছিলেন। সবশেষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন—এ সম্পর্কে হুযুর (সা)-এর নির্দেশ এরূপ ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجزو عذابٌ عذب به الامم ثم بقى منه بقية فيذهب المرّة ويأتى الاخرى فمن سمع به بارض فلا يقدمنّ عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارًا منه- رواه البخارى عن اسامة بن زيد واخرجه الائمة بمثله-

অর্থাৎ "রসূল (সা) প্লেগ মহামারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, এটা একটা আযাব, যদ্দ্বারা পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর কিছু অংশ

অবশিষ্ট রয়েছে। এখন তা কখনো চলে যায় আবার কখনো চলে আসে। তাই যদি কেউ শুনে যে, অমুক জায়গায় এ রোগ দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে কোন অবস্থাতেই তার যাওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে সেখানে রয়েছে, সে যেন সে স্থান ত্যাগ না করে। (বোখারী)

হযরত ফারূকে আযম (রা) এ হাদীস শোনার পর সঙ্গীদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন। শামের তদানীন্তন প্রশাসক হযরত আবু ওবায়দাও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফারূকে-আযম (রা)-এর এ আদেশ শুনে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

افرارا من قدر الله অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর থেকে পালাতে চান! উত্তরে ফারূকে-আযম (রা) বললেন—আবু ওবায়েদ! যদি অন্য কেউ একথা বলত! তোমার মুখে এমন কথা বিস্ময়কর! অতঃপর বললেন ঃ

نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله "হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর থেকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরের দিকেই আমরা পলায়ন করছি।"

উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহ্‌র আদেশেই করছি, যা রাসূল (সা)-এর যবানীতে আমরা জানতে পেরেছি।

প্লেগ সম্পর্কে মহানবী (সা)-র উক্তির দর্শন ঃ রসূল (সা)-এর উল্লিখিত উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে, কোন শহরে বা বিশেষ কোন এলাকায় যদি মহামারী দেখা দেয়, তবে অন্য স্থানের লোকদের পক্ষে সে স্থানে যাওয়া নিষেধ এবং সে স্থানের লোকদের মৃত্যুর ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করাও নিষেধ।

এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, মহামারীগ্রস্ত এলাকায় বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই লিখিত ছিল; তার হায়াত এতটুকুই ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হল এই যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়, বরং সাধ্যমত ঐ সব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্‌র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? তারা তো একা থেকে ভয়েই মারা যাবে। আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রূষাই বা কিভাবে চলবে? যারা মারা যাবে, তাদের দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়ত, যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা। প্রসঙ্গক্রমে ইবনুল-মাদয়িনী মনীষীদের এ কথার উল্লেখ করেছেন ঃ ما فر احد من الوباء فسلم—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহামারী থেকে পলায়ন করে, সে কখনো অক্ষত থাকতে পারে না।—(কুরতুবী)

তৃতীয়ত, যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। যেমন, হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

روى البخارى عن يحيى بن يعمر عن عائشة انها اخبرته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرها النبى صلى الله عليه وسلم انه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابرًا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد - وهذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة والمطعون شهيد - (قرطبى - صفه - ٢٣٥ ج ٣)-

অর্থাৎ ইমাম বোখারী (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রসূল (সা)-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল (সা) তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভিতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা একে মু'মিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুযুর (সা)-এর বাণী—'প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'-এর ব্যাখ্যাও তাই।

বিশেষ বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম ঃ হাদীস শরীফে فلا تخرجوا فرارا منه বলা হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে নয়, বরং অন্য কোন প্রয়োজনে সে জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যায় তবে সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারবো না, আমার সময় শেষ হলে যেখানেই যাব মৃত্যু সেখানেই হবে। আর মৃত্যুর সময় না হলে এখানে থেকেও মৃত্যু হবে না—এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শুধু আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য যদি অন্যত্র চলে যায়, তবে সেও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন বহিরাগত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অঞ্চলে কোন প্রয়োজনে প্রবেশ করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, এখানে এসেছি বলেই মৃত্যু হবে না; বরং মৃত্যু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন, তবে এমতাবস্থায় তার পক্ষেও সেখানে গমন করা জায়েয।

তৃতীয় মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে ঃ

এ আয়াতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে, প্রায় একই রকম বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۔ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি, উপরন্তু জিহাদের ময়দানে শাহাদত বরণকারীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হতো না। (হুযুর [স]-কে আদেশ দেওয়া হলো) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যদি মৃত্যু হতে রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হয়ে থাকে, তাহলে বরং নিজের জন্য চিন্তা এবং নিজেকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর অর্থাৎ মৃত্যু জিহাদে যাওয়া-না-যাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, ঘরে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু আসবেই।

এটা একান্তই আল্লাহ্‌র কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহ্‌র অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা), যার সমগ্র ইসলামী জীবনই জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জিহাদে শহীদ হন নি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে

বাড়ীতে ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই, যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ্ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তোমরা জিহাদে যাওয়াকে মৃত্যু এবং পলায়নকে মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা মনে করো না, বরং আল্লা্র আদেশ পালন করে উভয় জাহানের নেকী হাসিল কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় বিষয়ই জানেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

(২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে করজ দেবে উত্তম করজ ; অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ্ই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জিহাদ প্রভৃতি সৎকাজে দানের প্রতি অনুপ্রেরণাঃ (এমন) কোন ব্যাক্তি আছে কি, যে আল্লাহ্কে ঋণ দেবে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে)। অতঃপর আল্লাহ্ সেই (ঋণের বিনিময়ে নেকী এবং ধন মান) বৃদ্ধি করে দেবেন অনেক বেশী গুণে। (এবং এমন কোন সন্দেহ করবে না যে, ব্যয় করলে ধন-সম্পদ কমে যাবে। কেননা এ তো) আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছাধীন। তিনিই কমী ও বেশী করেন। (ব্যয় করা না করার মধ্যে তা নির্ভরশীল নয়) এবং তোমরা তাঁরই দিকে (মৃত্যুর পর) নীত হবে। (সুতরাং এখন সৎপথে ব্যয় করার প্রতিদান এবং ওয়াজিব কাজে ব্যয় না করার শাস্তি তোমরা পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا—করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহ্র পথে

ব্যয় করা। এখানে 'করজ' বা 'ঋণ' শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে একটি খেজুর দান করলে, আল্লাহ্ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী হবে।

আল্লাহ্‌কে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرّةً الا كان كصدقتها مرتين ٥
(مظهری بحوالۂ ابن ماجه)-

অর্থাৎ কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদ্‌কা করার সমতুল্য।

(২) ইবনে আরাবী (রা) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব্ অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে; আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ -

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা শোনার সাথে সাথেই এ আয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন—আবুদ-দাহ্‌দাহ্ (রা) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ্ রসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ্ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন পড়ে না! আল্লাহ্‌র রসূল (সা) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দাহ্‌দাহ্ একথা শুনে বললেন—হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা), হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আবুদ্ দাহ্‌দাহ্ বলতে লাগলেন, "আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্‌কে ঋণ দিলাম। রাসূল (সা) বললেন, একটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। আবুদ দাহ্‌দাহ্ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম—যাতে খেজুরের ছয়শত ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সা) বললেন, এর বদলে আল্লাহ্ তোমাকে বেহেশত দান করবেন।

আবুদ্ দাহ্দাহ্ (রা) বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كم من عذق رداح ودار فياح لابى الدحداح (قرطبى)

অর্থাৎ খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদ-দাহ্দাহ্র জন্য তৈরী হয়েছে।

(৩) ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোন শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশী দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان خياركم احسنكم قضاءً —তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।

তবে, যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ
قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۭ
قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاۗىِٕنَا ۭ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا
اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ
نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۭ قَالُوْٓا اَنّٰى
يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۭ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ
اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ
الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ
بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ
فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا
لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ
اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً
كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا
لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ
اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

(২৪৬) মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না! তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদের ভাল করে জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর! অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন—নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। (২৪৮) বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারূন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়! আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে

সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সেই পানি সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্‌র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে।

আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) অতঃপর যখন যুদ্ধার্থে তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের **মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ—আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফির জাতির বিরুদ্ধে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালুতের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ্ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।**

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর যোগসূত্র ঃ এখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহ দানই বিশেষ উদ্দেশ্য। পূর্বের ঘটনাটিও তারই ভূমিকা। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বিষয়টিও তারই সমর্থন। সামনে তালুত ও জালুতের কাহিনী একই বিষয়ের সমর্থন করছে। তদুপরি উক্ত কাহিনীতে আল্লাহ্ তা'আলা কার্পণ্য ও উদারতার বিষয়টিও দেখিয়েছেন, যার আলোচনা পূর্ববর্তী وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ আয়াতে রয়েছে। দরিদ্রকে রাজা করা, আবার রাজার রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া সবই তাঁর ইচ্ছা।

তালুত ও জালুতের কাহিনী ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি বনী ইসরাঈলের সে কাহিনী যা মূসা (আ)-র পরে ঘটেছিল, অবগত হওনি (যার পূর্বেই তাদের উপর কাফির জালুত বিজয় অর্জন করে তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদ অধিকার করে নিয়েছিল) ? যখন তারা তাদের এক নবীকে বলল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন যাতে আমরা (তাঁর সাথে মিলে) আল্লাহ্‌র পথে (জালুতের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করতে পারি। সেই নবী বললেন, এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি, যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা (সে সময়) জিহাদ করবে না ? তখন তারা বলল, এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করব না ? অথচ (জিহাদের একটি কারণও রয়েছে যে,) সে (কাফিররাই) আমাদেরকে

নিজেদের আবাসভূমি এবং ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকেও বিতাড়িত করেছে। (কেননা, তাদের কোন কোন জনপদ কাফিররা দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের ছেলে-মেয়েদেরকেও বন্দী করেছিল)। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হলো। তখন মাত্র ক'টি ছোট দল ছাড়া সবই বিরত রইল। (যেমন, সামনে তাদের জিহাদের উদ্দেশ্যে নেতা নির্বাচনের আগ্রহ এবং পরে তাদের বিরত থাকার ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদেরকে (আদেশ অমান্যকারিগণকে) ভাল-ভাবেই জানেন। (সবাইকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন) এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালুতকে তোমাদের বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন। তারা তখন বলতে লাগলো, তাঁর পক্ষে আমাদের উপর রাজত্ব করার কি অধিকার থাকতে পারে? অথচ তাঁর তুলনায় রাজত্ব করার অধিকার আমাদেরই বেশী। আর তাঁকে আর্থিক সঙ্গতিও আমাদের চাইতে বেশী দেওয়া হয়নি (কারণ, তালুত ছিলেন দরিদ্র)। সেই নবী (উত্তরে) বললেন, (একে তো) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তুলনায় তাঁকে নির্বাচন করেছেন (এবং নির্বাচনের ভাল-মন্দ আল্লাহ্ই বেশী অবগত) এবং (দ্বিতীয়ত রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনার) জ্ঞান এবং শারীরিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে বেশী যোগ্যতা দিয়েছেন। (বাদশাহ্ হওয়ার জন্য বিদ্যা ও শারীরিক যোগ্যতাই অধিক প্রয়োজন, যাতে রাজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ভাল হবে এবং শারীরিক সামর্থ্যও এ অর্থে প্রয়োজন যে, পক্ষ ও বিপক্ষ সবার অন্তরে ভয়-ভীতির বিস্তার হবে)। এবং (তৃতীয়ত) আল্লাহ্ তা আলা (রাজত্বের মালিক) স্বীয় রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন (কোন প্রশ্নের তোয়াক্কা করেন না)। এবং (চতুর্থত) আল্লাহ্ তা'আলাই প্রাচুর্যদাতা (তাকে দৌলত দিতে অসুবিধা কি যে, সে সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে) এবং জানেন (কে রাজত্ব করার যোগ্যতা রাখে)। আর (তারা যখন নবীকে বলল যে, যদি তাঁর বাদশাহ্ হওয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তবেই আমাদের মনে অধিক শান্তি ও দৃঢ়তা আসবে। তখন) তাদের নবী বললেন, তাঁর (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) বাদশাহ্ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি (তোমাদের আনয়ন ছাড়াই) এসে যাবে; যার মধ্যে শান্তি (ও বরকতের) বস্তু রয়েছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে। (অর্থাৎ তওরাত। বলা বাহুল্য, তওরাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত গ্রন্থ)। এবং (তাতে রয়েছে) কিছু অবশিষ্ট বস্তু, যা হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ) রেখে গিয়েছেন। (তাঁদের কিছু পোশাক ইত্যাদি)। এ সিন্দুকটি ফেরেশতাগণ নিয়ে আসবে। তাতেই (এভাবে সিন্দুকের আগমনেই) তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক। অতঃপর যখন (বনী ইসরাঈলরা তালুতকে বাদশাহ্ মেনে নিল এবং জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হলো এবং) তালুত সৈন্য নিয়ে (নিজের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাস্ থেকে আমালেকার দিকে রওয়ানা হলেন) তখন তিনি (নবীর মাধ্যমে ওহী দ্বারা অবগত হয়ে সঙ্গীদের) বললেন, এখন আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততা সম্পর্কে) তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নহর দ্বারা (যা পথেই পড়বে এবং কঠিন পিপাসার সময় তা তোমরা পার হবে)। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে (অতিমাত্রায়) পানি পান করবে তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা তা মুখেও না তুলবে (এবং প্রকৃত আদেশ

তাই) সে আমার দলভুক্ত। কিন্তু যারা তাদের হাতে এক আঁজলা পান করবে (তবে এতটুকু রেহাই দেওয়া গেল। যা হোক, রাস্তার সে নহর পূর্ণ পিপাসার সময় পার হতে হয়েছে) তাই সবাই তা থেকে মাত্রাতিরিক্তরূপে পানি পান করতে আরম্ভ করলো। তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোক তা' হতে বিরত রইল। (কেউ মোটেই পান করল না; আর কেউ কেউ এক আঁজলার বেশী পান করেনি। সুতরাং তালুত এবং তাঁর সাথের মু'মিনগণ নহর অতিক্রম করলো। আর তাদের দলকে দেখলো); দেখা গেল, সামান্য কয়েকজন মাত্র রয়ে গেছে। (তখন কেউ কেউ পরস্পর) বলাবলি করতে লাগলো, আজ (আমাদের দল এতো ক্ষুদ্র যে, এমতাবস্থায়) আমাদের মধ্যে জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। (একথা শুনে) এসব লোক যাদের এ ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, বলতে লাগলো, অনেক (ঘটনা এরূপ ঘটেছে যে, অনেক) ছোট ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে পরাজিত করেছে। (আসল হচ্ছে দৃঢ়তা) এবং আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ় ব্যক্তিদের সাথে থাকেন। আর যখন (তাঁরা আমালেকা অঞ্চলে পদার্পণ করলেন) এবং জালুত ও তার সৈন্যদের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন (বললেন) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর (আমাদের অন্তরে) দৃঢ়তা দান কর (যুদ্ধের সময়) এবং আমাদেরকে এ কাফির জাতির উপর বিজয়ী কর। অতঃপর তালুত জালুতের বাহিনীকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে পরাজিত করলো এবং দাউদ (আ) (যিনি তখন তালুত-বাহিনীতে ছিলেন এবং তখনো নবুয়ত প্রাপ্ত হন নি) জালুতকে হত্যা করলেন (এবং বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন)। আর (তারপর) তাঁকে (দাউদকে) রাজত্ব এবং হেকমত (হেকমত বলতে এ স্থলে নবুয়ত) দান করলেন। আর তাঁকে যা ইচ্ছা ছিল তাই শিক্ষা দিলেন। (যেমন, যন্ত্রপাতি ছাড়াই বর্শা তৈরী করা, পশু-পাখী এবং জীবজন্তুর ভাষা বোঝা, তারপর ঘটনার শুভাশুভ বর্ণনা করা প্রভৃতি)। আর যদি এরূপ না হতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন লোককে (যারা দাঙ্গাপ্রিয়) কোন কোন লোক দ্বারা (যারা সময় সময় ভাল কাজ করে তাদেরকে দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের উপর জয়ী না করতেন,) তবে দুনিয়ার শৃঙ্খলা (সম্পূর্ণভাবে) বিঘ্নিত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াবাসীর প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান (বলেই সময় সময় তাদের সংশোধন করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

সেই বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমালেকার কাফির-দেরকে তাদের উপর চড়াও করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোধনের চিন্তা হলো। এখানে যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি 'শামঈল' নামে পরিচিত।

اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ —বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর

পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলগণ যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখতো, আল্লাহ্ তা'আলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফিররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অপারক ও অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করলো এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম।

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ—এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোককেও বিচলিত করে। এসব লোককে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বেশী প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারিগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেলো। রূহুল-মা'আনীতে ইবনে আবি হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কথাও চিন্তা করেন নি।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

(২৫২) এগুলো হলো আল্লাহ্র নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেহেতু কোরআন-করীমের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে হুযুরে আকরাম (সা)-এর

নবুয়ত প্রমাণ করা কাজেই যেখানে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেখানে তার পুনরাবৃত্তি করে এক্ষেত্রে আলোচ্য কাহিনী সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেওয়া যা তিনি কখনও কারো কাছে পড়েন নি, কারো কাছে শুনেন নি কিংবা তিনি নিজেও দেখেন নি---এটাও একটা মো'জেযা, যা হুযুর আকরাম (সা)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে---

নবুয়তে মুহাম্মদীর দলীল ঃ এ (আয়াতসমূহ যাতে সে কাহিনীই বিবৃত হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন, যা সঠিকভাবে আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছি এবং (এতে প্রমাণ হয় যে,) তিনি নিঃসন্দেহে নবী।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

(২৫৩) এই রসূলগণ—আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা, যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মো'জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রুহুল-কুদস'—অর্থাৎ জিবরাঈলের দ্বারা। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পিছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফির। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কতিপয় নবী ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা ঃ প্রেরিত এই রসূলগণ (যাঁদের কথা اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ অংশে বলা হয়েছে) এমন যে, আমি তাদের মধ্যে কতিপয়কে উর্ধ্বে মর্যাদা দান করেছি। (যেমন) তাদের মধ্যে কেউ আছেন যাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াই) আল্লাহ্ (সরাসরি) কথা বলেছেন (অর্থাৎ মূসা [আ])। আবার কাউকে তাদের মধ্যে অতি উচ্চ-মর্যাদায় বরণ করেছি এবং আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রকাশ্যে দলীল (মো'জেযা) দান করেছি এবং আমি তার সমর্থন রূহুল কুদ্‌স (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল [আ]-এর দ্বারা করেছি (যিনি ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সব সময় তাঁর সাথে থাকতেন)। আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তবে (উম্মতের) যারা (ঐ নবী-গণের) পরে এসেছে (কখনও ধর্মীয় মতানৈক্য করে) পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো না, তাদের কাছে (সত্য বিষয়ের) প্রমাণ (নবীদের মাধ্যমে) উপস্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর। (যার প্রেক্ষিতে উচিত ছিল ধর্মকে গ্রহণ করা) কিন্তু (যেহেতু এতে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু হেকমত ছিল, এজন্য তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতৈক্য সৃষ্টি করেন নি। ফলে) তারা পরস্পর (ধর্মীয় ব্যাপারে) ভিন্ন ভিন্ন দল (বিভক্ত) হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে আর কেউ কাফির রয়ে গেছে। (এমনকি এ মতানৈক্যের দরুন যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত বেধে গেছে) আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা (স্বীয় হেকমত অনুযায়ী) যা ইচ্ছা (নিজের কুদরতে) তাই করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) আয়াত تِلْكَ الرُّسُلُ-এর বক্তব্যে নবী করীম (সা)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁর নবুয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ যা اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফিররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা-সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেক লোক বিরুদ্ধাচরণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহ্‌র বহু রহস্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

(২) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেনে, অথচ হাদীসে রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ لا تفضلوا-

بين انبياء الله —অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।" তিনি আরো বলেছেন ঃ لا تخيروني على موسى —আমাকে মূসা (আ)-র চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না। আরো উক্ত হয়েছে لا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى —"আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম।"

এ হাদীসগুলোতে কোন নবীকে অন্য নবী অপেক্ষা উত্তম বলে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের আয়াত এবং এসব হাদীসে উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট আপাত-বিরোধ সম্পর্কে বলা যায় যে, এসব হাদীসের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের মনমত কোন নবীকে কোন নবীর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা নিষিদ্ধ। কারণ বিশেষ কোন নবীর মর্যাদা অন্যের তুলনায় বেশী হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁরই মর্যাদা বেশী। বলা বাহুল্য, এ তারতম্য আল্লাহ্‌র দ্বারাই নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁরই জানা। মতামত কিংবা তুলনার মাধ্যমে এটা স্থির করার বিষয় নয়। তবে কোরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে যদি কোন নবীর মর্যাদা অন্য নবী অপেক্ষা বেশী বলে অনুমিত হয়, তবে এতে বিশ্বাস রাখা দূষণীয় হবে না। মহানবী (সা)-র এই বাণী ঃ

لا تخيروني على موسى এবং لا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى

হয়তো ঐ সময়ের যখন তাঁকে জানানো হয়নি যে, তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে একথা জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি সাহাবীগণের নিকট একথা প্রকাশও করেছেন।—(মাযহারী)

(৩) مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ —হযরত মূসা (আ)-র সাথেই আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার আয়াতে مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়)—আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ)-র সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

(২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফিররাই হলো প্রকৃত জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে দেরী করা অনুচিত ঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর, কিয়ামতের সে দিনটি আসার আগে যে দিন (কোন কিছুই নেক আমল বা সৎকর্মের পরিপূরক হতে পারবে না। কেননা, সেদিন) বেচাকেনাও চলবে না (যে, কোন বস্তুর বিনিময়ে নেক আমল ক্রয় করবে)। আর না (অমন) বন্ধুত্ব থাকবে (যে, কেউ তোমাদেরকে নিজের নেক আমল দিয়ে সাহায্য করবে) আর নাইবা (আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো) কোনও সুপারিশ (কার্যকর) হবে (ফলে তোমাদের আর সৎ কাজের প্রয়োজন হবে না)। কাফিররা (নিজের কর্মশক্তি এবং ধন-সম্পদ অস্থানে ব্যয় করে নিজের উপর) জুলুম করে। (তেমনিভাবে তারা শারীরিক ও অর্থনৈতিক আনুগত্য পরিহার করে পাপাচারের পথ অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা তাদের মত হয়ো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎ কাজের মধ্যে জানমাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তা' ছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হল যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ—শীর্ষক আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত ঃ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ-এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে—তাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ..... ---অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মোয়ামালাত নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূতেও বেশীর ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না ; যতক্ষণ আল্লাহ্ নিজে না ছাড়বেন।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ
لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا
الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

(২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সেসবই তিনি জানেন; তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর

সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (এমন যে,) তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। তিনি জীবিত (যার কোনদিন মৃত্যু হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে) তিনি রক্ষা (করেন) ও আয়ত্তে রাখেন। না, তাঁকে তন্দ্রা কাবু করতে পারে, না নিদ্রা (কাবু করতে পারে)। তাঁর রাজত্বের আওতায়ই সব কিছু, (যা কিছু) আসমান ও যমীনে রয়েছে। এমন কে আছে, যে ব্যক্তি তাঁর নিকট (কারো জন্য) সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? তিনি জানেন (সমস্ত) সৃষ্টির, যাবতীয় অতীত ও বর্তমান অবস্থা। আর এ সৃষ্টিরাজির পক্ষে তাঁর জানা বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কেউ কোন কিছুই নিজের জ্ঞান-সীমায় পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটা (জ্ঞানদান করতে তিনি) ইচ্ছা করেন ততটাই (পেতে পারে)। তাঁর সিংহাসনটি (এত বিরাট ও ব্যাপক যে,) সমস্ত আসমান ও যমীনকে নিজের বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর আল্লাহ্র পক্ষে সে দু'টির (আসমান ও যমীনের) রক্ষণাবেক্ষণে কোনই অসুবিধা হয় না। তিনি মহান-মহীয়ান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত ঃ এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মস্নাদে আহ্মদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূল (সা) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল-কুরসী। রসূল (সা) তা সমর্থন করে বললেন---হে আবুল মান্যার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

হযরত আবুযর (রা) রসূল (সা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! কোরআনের বৃহত্তম আয়াত কোন্টি? তিনি উত্তরে বললেন, আয়াতুল-কুরসী।
---(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সূরা বাক্বারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কোরআনের অন্য সব আয়াতের সর্দার বা নেতা। সে আয়াতটি যে ঘরে পড়া হয়, তা থেকে শয়তান বেরিয়ে যায়।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযুরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, "যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।" অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মু-খীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এখন বিস্তারিতভাবে এর বাক্য-গুলো লক্ষ্য করা যাক। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে।

প্রথম বাক্য ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ—এতে 'আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ—সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ্' সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য ঃ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আরবী ভাষায় حَيٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন ; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَيُّوْمٌ শব্দ 'কিয়াম' শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়্যুম' আল্লাহ্র এমন এক বিশেষ গুণ, যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়্যুম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আবদুল কাইয়্যুম' নামকে বিকৃত করে শধু 'কাইয়্যুম' বলে তারা গোনাহ্গার হবে।

আল্লাহ্র গুণবাচক নামের মধ্যে حَيٌّ وَقَيُّوْمٌ অনেকের মতে 'ইসমে-আযম'। হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রসূল

(সা)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে يا حى - يا قيوم বলছেন।

তৃতীয় বাক্য ঃ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ সীন এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نَوْمٌ পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়্যুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার ঊর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তার সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্র ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য ঃ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'لام' অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য ঃ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ অর্থ হচ্ছে এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে। তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্র কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—রসূল (সা) বলেছেন ঃ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে 'মাকামে-মাহ্মুদ' বলা হয়, যা হুযুর (সা)-এর জন্য খাস; অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য ঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

অগ্রপশ্চাৎ যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাৎ বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহ্র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাৎ বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের ওপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য ঃ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ অর্থাৎ মানুষ

ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন, শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের আওতাভুক্ত—এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য ঃ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত

বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ্ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবূযর গিফারী (রা)-র উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযুর (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার ইখতিয়ারে আমার প্রাণ, তাঁর কসম—কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ।

নবম বাক্য ঃ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ দুটি

বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাযত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য ঃ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্ববর্তী নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

(২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইসলাম) ধর্মে (গ্রহণ করার ব্যাপারে) কোন বাধ্যবাধকতা (আরোপের কোন স্থান) নেই, (কেননা) হেদায়েত নিশ্চয়ই গোমরাহী হতে পৃথক হয়ে গেছে। (অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাতে জোর করার কোন স্থান নেই। 'ইক্‌রাহ্' বলা হয় অপছন্দনীয় কাজে কাউকে বাধ্য করাকে। আর ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে) কাজেই যারা শয়তানের প্রতি বিরূপ হবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করবে) তারা অত্যন্ত শক্ত বৃত্তকে আশ্রয় করেছে। যা কোন প্রকারেই নষ্ট হতে পারে না। এবং আল্লাহ্ তা'আলা (বাহ্যিক) বিষয়েও অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং (অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও) অত্যন্ত জ্ঞানের অধিকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ির ছিঁড়ে

১৬/২/৯০

পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার। ---(বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ ইসলামে জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফিরগণকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জিহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফিররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদকারীকে পছন্দ করেন না।

এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে আদেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালিমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রা) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল, انا عجوز كبيرة والموت الى قريب আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর (রা) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জিহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও কেতালের নির্দেশ لا اكراه فى الدين আয়াতের পরিপন্থী নয়।---(মাযহারী)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـــُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ... ... خٰلِدُوْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত লোকের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে। তাদেরকে তিনি (কুফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোর দিকে আনয়ন করেন। আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হল (মানুষ ও জিন) শয়তান। যে তাদেরকে (ইসলামের) আলো হতে বের করে (কুফরের) অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এসব মানুষ (যারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফর গ্রহণ করে) দোযখের বাসিন্দা হবে (এবং) তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সব-চাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফির বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۗجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ

أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ
مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ
وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

(২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বলল, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত) তুমি কি সে ব্যক্তির কাহিনী অবগত হওনি (অর্থাৎ নমরূদের) যে ব্যক্তি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তর্ক করেছিল্ নিজের পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ্! সে আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল) এজন্য যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন (অর্থাৎ তার উচিত ছিল রাজত্বের নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করা এবং ঈমান আনা। কিন্তু সে আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে কুফরী করতে আরম্ভ করলো। আর এমনটি তখন আরম্ভ হয়েছিল) যখন (তার প্রশ্নের উত্তরে যে, আল্লাহ্র স্বরূপ কি) ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন যে, আমার পালনকর্তা এমন যে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। (জীবিত করা এবং মৃত্যু ঘটানো তাঁর ক্ষমতাধীন। সে জীবিত করা ও মৃত্যু ঘটানোর অর্থ বুঝেনি, তাই) বলতে লাগলো (এ কাজ তো আমিও করতে পারি) আমিও জীবিত রাখি এবং মারি। (যাকে ইচ্ছা হত্যা করি, এটাই তো মারা। আর যাকে ইচ্ছা হত্যা থেকে রেহাই দেই। আর এটাই তো জীবিত রাখা। ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, এ মোটা বুদ্ধির লোক, তাই এটাকে জীবন দান ও মৃত্যু দান মনে করে। অথচ জীবন দান অর্থ প্রাণহীন বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করা এবং মৃত্যু দান অর্থ প্রাণনাশ করা। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সে জীবিত করা আর মৃত্যু ঘটানোর তাৎপর্যই বুঝে না। কাজেই) হযরত ইবরাহীম (আ) তখন (অন্য যুক্তির দিকে গেলেন) বললেন, (যাক) আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে (প্রত্যেক দিন) পূর্ব দিকে উদিত করেন, তুমি (মাত্র একদিন) পশ্চিম দিকে উদয় কর। এতে সে হতভম্ব হয়ে গেল। (সে কাফির

আর কোন উত্তর দিতে পারলো না। এ যুক্তির পর তার উচিত ছিল হেদায়েত গ্রহণ করা। কিন্তু সে তার গোমরাহীতেই ডুবে রইল)। এবং আল্লাহ্ তা'আলার (নিয়ম হচ্ছে) এমন পথহারাদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফির ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, যদি আল্লাহ্ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়! যেমন, মানুষ এ মো'জেযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।---(বয়ানুল-কোরআন)

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ
عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً
لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

(২৫৯) তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ী-ঘরগুলো ভেঙে ছাদের উপর পড়েছিল। বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন! বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনেরও কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে—সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল—আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ... ... أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

এমন কাহিনীও কি তোমরা জান (যে, এক লোক ছিল। একবার চলতে চলতে সে) এমন এক জনপদের উপর দিয়ে (এমনি অবস্থায়) অতিক্রম করল যে, তার বাড়ী-ঘরগুলো ছাদের উপর পড়ে রয়েছে (অর্থাৎ প্রথমে ছাদ ভেঙে পড়েছে এবং পরে এর উপর ঘরগুলো পতিত হয়েছে অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলে জনপদটি সম্পূর্ণ বিরান হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত লোক মরে গিয়েছিল)। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ এ জনপদের মৃত ব্যক্তিদের কিভাবে (কিয়ামতের দিন) জীবিত করবেন। (তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সকল মৃত ব্যক্তিকেই জীবিত করবেন। এতদসত্ত্বেও জীবিত করার ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে মনে এমন একটা ভাব সৃষ্টি হলো যে, মৃতের পুনর্জীবন দানের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা না জানি আল্লাহ্ পাক কিভাবে সম্পন্ন করবেন! কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই যে কোন কাজ আনজাম দিতে পারেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো যে, এ দৃশ্যটি এ দুনিয়াতেই তাকে দেখিয়ে দেন। তাতে একটি দৃষ্টান্তও স্থাপিত হবে এবং এর দ্বারা লোকেরা হেদায়েতপ্রাপ্তও হবে। সুতরাং এজন্য) আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে মৃত্যু দিয়ে একশ' বছর পর পুনরায় তাকে জীবিত করলেন (এবং পরে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতদিন এ অবস্থায় ছিলে? সে উত্তর দিল, একদিন রয়েছি কিংবা একদিনের কিছু কম (সময়)। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, না; বরং একশ' বছর (তুমি এ অবস্থায়) ছিলে। (যদি তোমার শরীরের কোন পরিবর্তন না হওয়াতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে থাক, তবে) তোমার খাবারগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর যে, একটুও পচে-গলে যায়নি (এটি আমার একটি কুদরত)। এবং (দ্বিতীয় কুদরত দেখার

জন্য) তোমার (বাহন) গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর (পচে-গলে তার কি অবস্থা হয়েছে)। এবং আমি অতি সত্বর একে তোমার সামনে জীবিত করে দেখাবো এবং আমি তোমাকে এজন্য (মেরে পুনরায় জীবিত করেছি) যে, আমি তোমাকে আমার কুদরতের একটি নযীর স্থাপন করছি। (যাতে এ ঘটনার দ্বারা কিয়ামতের দিন জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যায়)। এবং (এখন সে গাধা) হাড়গুলোর দিকে দেখ; আমি এগুলোকে কিভাবে একত্রে সংযোজিত করছি। অতঃপর এতে মাংস লাগিয়ে দিচ্ছি ; পরে তাকে জীবিত করছি ? (মোট কথা, এসব কাজ এভাবেই করে দেওয়া হবে)। অতঃপর যখন এসব অবস্থা উক্ত ব্যক্তিকে দেখানো হলো, তখন (সে উদ্বেলিত হয়ে) বলে উঠলো, আমি (অন্তরে) দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কাজের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ
أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ
جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ
أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

(২৬০) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক ; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়ের (ঘটনার) কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) নিবেদন করছিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার ! আমাকে (সে বিষয়টি) দেখাও যে, মৃতদেরকে (কিয়ামতে) কেমন করে জীবিত করবে (অর্থাৎ জীবিত করা তো নিশ্চিত, কিন্তু জীবিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে তা আমার জানা নেই, কাজেই

তা জানতে মন চায়। এ প্রশ্নে কোন স্বল্পবুদ্ধি-ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে যে নাউযুবিল্লাহ্ ; ইবরাহীম (আ)-এর মনে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে একীন ছিল না ! সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এ প্রশ্নের অবতারণা করে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তাই এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে ইবরাহীম (আ)-কে বললেন—তুমি কি এতে বিশ্বাস কর না ? (তিনি উত্তরে) আরয করলেন---বিশ্বাস তো অবশ্যই করি কিন্তু এ উদ্দেশ্যে আরয করছি যাতে আমার অন্তর (নির্ধারিত পুনর্জীবন পদ্ধতি দেখে) প্রশান্তি লাভ করতে পারে (এবং অন্যান্য সম্ভাবনার ফলে যেন মনে নানা প্রশ্নের উদয় না হয়)। আদেশ হলো, তবে তুমি চারটি পাখী ধর। অতঃপর সেগুলোকে নিজের কাছে রাখ। (যাতে ভালভাবে সেগুলো তোমার সাথে পরিচিত হয়ে যায়) অতঃপর (সেগুলোকে জবাই করে কিমার মত সংমিশ্রিত করে নিয়ে কয়েক ভাগে বিভক্ত কর এবং নিজের ইচ্ছামত কয়েকটি বেছে নিয়ে) প্রত্যেক পাহাড়ে এক একটি অংশ রেখে দাও। (এবং) পরে এগুলোকে ডাক।, (দেখবে জীবিত হয়ে) তোমার কাছে ফিরে আসবে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমের (তথা কুদরতের) অধিকারী। (তিনি সবকিছুই করতে পারেন, কিন্তু তবু কোন কোন কাজ করেন না। তার কারণ এই যে,) তিনি বিজ্ঞ (ও) বটেন। (আর প্রতিটি কাজই সে বিজ্ঞতা অনুযায়ী করে থাকেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবন দান প্রত্যক্ষীকরণ ঃ এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনজীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কি ? আমার সর্বসময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই ? ইবরাহীম (আ) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন ? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ-সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে ; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়।

প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখী ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনিও যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতে পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলি আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে এসে তোমার কাছে পড়বে।

তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে ইবনুল-মান্‌যারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, মাংসের সাথে মাংস ও রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন---হে ইবরাহীম! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিব। কোরআনের ভাষায়ঃ يَأْتِينَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখী দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়! আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আবার এর অণু-পরমাণু দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে একত্র করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না।

অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্ব সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি। মানুষের জন্ম যে পিতা-মাতার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যে খাদ্যে তাদের শরীর ও রক্ত গঠিত হয়, সেগুলোও বিশ্বের আনাচ-কানাচ থেকে সংগৃহীত অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ মাত্র। তার-পর জন্মের পরে তার লালন-পালনে যেসব খাদ্য-খাবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যদ্দ্বারা তার রক্ত-মাংস গঠিত হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তার খাদ্য সামগ্রীতে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন অণু-পরমাণু দ্বারাই গঠিত। শিশু

যে দুধ খায় তা কোন গাভী, মহিষ বা বকরীর অংশ বিশেষ। সংশ্লিষ্ট জীবগুলোতে এসব অংশ সে ঘাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে যা তারা খেয়েছে। আর এসব বস্তু না জানি কোন্ কোন্ দেশ থেকে এসেছে। আর না জানি বায়ু কোন্ কোন্ দেশ থেকে বিভিন্ন অণু-পরমাণুকে এগুলোর উৎপাদনের সাথে মিশিয়েছে। এমনিভাবে দুনিয়ার বীজ, ফল-মূল, তরি-তরকারী এবং মানুষের প্রত্যেকটি খাদ্য-সামগ্রী ও ঔষধ-পত্র যা তাদের দেহের অংশে পরিণত হয়, তা বিশ্বের কোন-না-কোন অংশ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং অনুপম ও সুশৃঙ্খল পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। যদি আত্মভোলা ও সংকীর্ণমনা মানুষ দুনিয়ার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের দেহ সম্পর্কে গবেষণা করতে বসে, তবে দেখতে পাবে যে, তার অস্তিত্ব বিশ্বের এমনি অসংখ্য অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ। যার কিছু প্রাচ্যের, কিছু পাশ্চাত্যের, কিছু উত্তরাঞ্চলের আর কিছু দক্ষিণ জগতের। আজও বিশ্বজোড়া বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে আল্লাহ্র অতুলনীয় ব্যবস্থাপনায় তার দেহে একত্র করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পরে সেসব অণু-পরমাণু পুনরায় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যাবে। তাহলে দ্বিতীয়বার এগুলোকে একত্র করা আল্লাহ্র পক্ষে তো কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়, যিনি প্রথমবার এগুলোকে একত্র করেছিলেন।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহ্র সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন।

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'ইতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই ইতমিনান লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও ইতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রসূল (সা)-এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'ইতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের ইতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। ইতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত

ইবরাহীম (আ) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটির দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

এক—তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না।

দুই—পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণত কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারগতা প্রকাশ করার জন্য বললেন, দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর! ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন أولم تؤمن —যাতে ইবরাহীম (আ) উত্তরে بلى 'হাঁ, বিশ্বাস করি' বলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রশ্ন থেকে অন্তত এতটুকু তো জানা গেল যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের পূর্ণ স্থিরতা ছিল না। অথচ বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন, "যদি অদৃশ্য জগতের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমার বিশ্বাস ও স্থিরতা একটুও বৃদ্ধি পাবে না। কেননা, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারাই আমার মধ্যে পূর্ণ স্থিরতা অর্জিত হয়েছে।" অতএব, কোন কোন উম্মতই যখন স্থিরতার এমন স্তরে উন্নীত রয়েছেন, তখন আল্লাহ্‌র খলীল ইবরাহীম (আ)-এর বিশ্বাসে স্থিরতা না থাকা কিরূপে সম্ভবপর?

এ সম্পর্কে বুঝে নেওয়া দরকার যে, স্থিরতারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক প্রকার স্থিরতা আল্লাহ্‌র ওলী ও সিদ্দীকগণ অর্জন করেন। এর চাইতে উচ্চ স্তরের স্থিরতা পয়গম্বরগণ লাভ করেন। এর চাইতেও উচ্চস্তরের আরেকটি স্থিরতা আছে, যা বিশিষ্ট নবী বা রসূলগণকে 'মুশাহাদা' তথা প্রত্যক্ষীকরণের মাধ্যমে দান করা হয়েছিল।

হযরত আলী (রা) স্থিরতার যে স্তরে উন্নীত ছিলেন, নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরও তা অর্জিত ছিল; বরং এর চাইতেও উচ্চস্তরের স্থিরতা—যা মকামে-নবুয়তের উপযুক্ত, তা তিনি লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি উম্মতের মধ্যে যে কারো চাইতে

শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরপর যে স্থিরতা তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের স্থিরতা, যা বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরকেই শুধু দান করা হয়েছে। উদাহরণত মহানবী (সা)-কে মি'রাজের মাধ্যমে বেহেশত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করিয়ে এ বিশেষ স্থিরতায় পৌঁছানো হয়েছিল।

মোট কথা, এ প্রশ্নের কারণে এমন মন্তব্য করাও ঠিক নয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর বিশ্বাসের স্থিরতা ছিল না। এক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, প্রত্যক্ষীকরণ দ্বারা যে পূর্ণ স্থিরতা অর্জিত হয়, তখনো পর্যন্ত তা ছিল না। আর এরই জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন!

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে ; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে 'ঈমান-বিল-গায়েব' তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে না।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ
يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي
يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ
فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ
اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

(২৬১) যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না। সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে

ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (২৬৫) যারা **আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য। তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।** (২৬৬) তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে, এর তলদেশ **দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।**

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ সৎকর্মে) স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়-কৃত ধন-সম্পদের অবস্থা (আল্লাহ্র কাছে এমন) একটি বীজের অবস্থার মত, যা থেকে (মনে কর) সাতটি শীষ জন্মায় (এবং) প্রত্যেক শীষের মধ্যে একশ'টি করে দানা থাকে (এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সওয়াব সাতশ' পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, এ বৃদ্ধি (তার আন্তরিকতা ও শ্রমের পরিমাণে) দান করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সুপ্রশস্ত। (তাঁর কাছে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবাইকে এ বৃদ্ধি দান করতে পারেন, কিন্তু সাথে সাথেই তিনি) মহাজ্ঞানী (ও বটে! তাই নিয়তের আন্তরিকতা ইত্যাদি দেখে দান করেন)। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, অতঃপর তা ব্যয় করার পর (যাকে দেয়, তাকে উদ্দেশ্য করে মুখে) অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং (ব্যবহার দ্বারা তাকে) কষ্ট দেয় না, তারা তাদের (কর্মের) সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে গিয়ে পাবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (যাচ্ঞার সময় উত্তরে যুক্তিযুক্ত ও) ন্যায্য কথা বলে দেওয়া এবং (যাঞ্চাকারী অশোভন আচরণ দ্বারা বিরক্ত করলে কিংবা বারবার যাঞ্চা করে অতিষ্ঠ করলেও তাকে) ক্ষমা করা (বহুগুণে) শ্রেয়, ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা যার পর কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা (স্বয়ং) সম্পদশালী; (কারও ধন-সম্পদে তাঁর প্রয়োজন নেই। কেউ ব্যয় করলে নিজের জন্যই করে। এমতাবস্থায় কষ্ট দেবে কি কারণে? কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। কারণ, তিনি সহিষ্ণু (ও বটে!) হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা কষ্ট দিয়ে স্বীয় খয়রাত

(-এ সওয়াব বৃদ্ধি)-কে বরবাদ করো না; সে ব্যক্তির মত যে (শুধু) লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে (এবং স্বয়ং খয়রাতের মূল সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়) আর আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না (বিশ্বাস স্থাপন করার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি মুনাফিক) অতএব, এ ব্যক্তির অবস্থা একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর (মনে কর) কিছু মাটি (জমেছে এবং মাটিতে কিছু তৃণলতাও শিকড় গেড়েছে। অতঃপর তার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়) অনন্তর তাকে (যেমন ছিল, তেমনি) সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (এমনিভাবে এ মুনাফিকের হাত থেকে যেন আল্লাহ্র পথে কিছু খরচ হয়ে গেলে বাহ্যত একে একটি সৎকর্ম বলে মনে হয় এবং এতে মনের মধ্যে সওয়াবের আশাও জাগে। কিন্তু তার নেফাক বা কপটতা তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। সেমতে কিয়ামতে) তারা স্বীয় উপার্জন সামান্যও হস্তগত করতে সক্ষম হবে না। (কেননা, উপার্জন অর্থ সৎকর্ম। তা হস্তগত হওয়া, অর্থ সওয়াব পাওয়া এবং সওয়াব পাওয়ার জন্য বিশ্বাস ও আন্তরিকতা শর্ত। অথচ এগুলো তাদের মাঝে নেই। কারণ, তারা যেমন রিয়াকার, তেমনি কাফির।) আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে (কিয়ামতের দিন সওয়াবের গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের) পথ প্রদর্শন করবেন না। (কেননা, কুফরের কারণে, তাদের কোন কর্মই গ্রহণীয় হয় না। গ্রহণীয় হলে এর সওয়াব পরকালে সঞ্চিত হতো এবং সেখানে পৌঁছে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেতো।) এবং তাদের ব্যয়কৃত সম্পদের অবস্থা, যারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (যা বিশেষভাবে এ কর্ম দ্বারা হবে) এবং এ উদ্দেশ্যে যে, স্বীয় মনকে (এ কঠিন কর্মে অভ্যস্ত করে) সুদৃঢ় করে, (যাতে অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন সহজ হয়। অতএব, তাদের ব্যয়কৃত সম্পদ ও সদকার অবস্থা) একটি বাগানের অবস্থার মত, যা কোন টিলায় অবস্থিত, (যার আবহাওয়া অনুকূল ও সুফলদায়ক) যাতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর (বাগানটি সুষম আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের দরুন অন্যান্য বাগানের চাইতে কিংবা অন্যান্য বারের চাইতে দ্বিগুণ (চতুর্গুণ) ফসল দান করে এবং যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণও (অর্থাৎ সামান্য বৃষ্টিপাতও) সেখানে যথেষ্ট। (কেননা, তার মাটি ও অবস্থান ভাল) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। (তাই আন্তরিকতা দেখলেই তিনি সওয়াব বাড়িয়ে দেন।) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে (অর্থাৎ তাতে বেশির ভাগ বৃক্ষ থাকবে খেজুর ও আঙুরের এবং) এর (বাগানের বৃক্ষের) তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে (যার ফলে বাগানটি খুব সজীব ও সবুজ হবে এবং) এ ব্যক্তির তাতে (খেজুর ও আঙুর ছাড়া) আরও সর্বপ্রকার (উপযুক্ত) ফল সকল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে (যা অধিক অভাব-অনটনের সময়) এবং তার সন্তান-সন্ততিও থাকবে, যাদের মধ্যে (উপার্জনের) শক্তি নেই (এমতাবস্থায় সন্তান-সন্ততির কাছেও সে শোনার আশা করতে পারবে না। সুতরাং বাগানটিই হবে তার জীবিকার একমাত্র উপায়)। অতএব, (এমতাবস্থায় এ ঘটনা হবে যে) এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন (অর্থাৎ দাহিকাশক্তি) রয়েছে, অনন্তর (তা দ্বারা) বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? (জানা কথা যে, কেউ নিজের এমনটি পছন্দ করতে

পারে না। অতএব, এ বিষয়টিও এরই সমতুল্য যে, কেউ কিয়ামতে ফলদায়ক হওয়ার আশায় খয়রাত করবে কিংবা অন্য কোন সৎকাজ করবে। কিয়ামতের সময়টিও হবে অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে। সেখানে এসব সৎকর্মই অধিকতর গ্রহণীয় হবে। অতঃপর এমন মুহূর্তে জানা যাবে যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করা কিংবা যাচ্নাকারীকে কষ্ট দেওয়ার কারণে সব দান-খয়রাত বরবাদ কিংবা বরকতহীন হয়ে গেছে, তখন কতই না পরিতাপ হবে এবং কত কত আশার গুড়ে পড়বে বালি! অতএব, তোমরা যখন উদাহরণে বর্ণিত ঘটনাকে পছন্দ কর না, তখন সৎকর্ম বরবাদ করাকে কিরূপে মেনে নিচ্ছ?) আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে বিভিন্ন নজির বর্ণনা করেন তোমাদের (অবগতির) জন্য, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর (এবং চিন্তা-ভাবনা করে তদনুযায়ী কাজকর্ম কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটি সূরা বাক্কারার ৩৬তম রুকূ, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনও এ সূরার পাঁচটি রুকূ বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকূতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকূতে ২৬২তম আয়াত থেকে ২৮৩তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে; এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা—একে সদ্কা ও খয়রাত বলা হয়।

(২) সুদের লেন দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু'রুকূতে দান-খয়রাতের ফযীলত, তৎপ্রতি উৎসাহ দান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু'রুকূতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে দেয়।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকূতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কোরআন পাক কোথাও انفاق শব্দে, কোথাও اطعام শব্দে, কোথাও صدقة শব্দে এবং কোথাও ايتاء الزكوة শব্দে ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দে এবং স্থানে স্থানে এদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, اطعام ও انفاق - صدقة প্রভৃতি শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। এগুলো সর্বপ্রকার দান-খয়রাত এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ব্যয়কেই বোঝায়, তা ফরয হোক, ওয়াজিব হোক কিংবা নফল ও মুস্তাহাব হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ ايتاء الزكوة ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকূতে বেশীর ভাগ انفاق শব্দ এবং কোথাও صدقة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব বিধান এখানে বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব রকম সদকা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সব প্রকারকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত ঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকিন, বিধবা ও এতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ জন্মাল এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব হাসিল হতে পারে।

সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশ গুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিহাদ ও হজ্জে এক দেরহাম ব্যয় করার সওয়াব সাতশ' দিরহামের সমান। মস্‌নদে আহ্‌মদের বরাত দিয়ে ইবনে-কাসীর হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

মোটকথা, এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ্‌র পথে এক টাকা ব্যয় করার সওয়াব সাতশ' টাকা ব্যয় করার সমান পাওয়া যায়।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ কিন্তু কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি উৎকৃষ্ট হবে—খারাপ হবে না, কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং ক্ষেতটিও সরস হবে। কেননা, এ তিনটির মধ্যে একটি বিষয়ের অভাব হলেও

হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে। কেননা, হাদীসে আছে—আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

(২) যে ব্যয় করবে, তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নামযশ অর্জনের জন্য যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষকসদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে। ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদ্‌কা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তি তালাশ করে ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের কারণে তাদের কোন চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ এ আয়াতে সদ্‌কা কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ অর্থাৎ সদ্‌কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দুটি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়ত, যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় যাচনাকারীর জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেওয়া এবং যাচনাকারী অশোভন আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয় সে দান-খয়রাতের চাইতে,